Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিয়া আক্তার

রোলঃ 216020720


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিয়া আক্তার

রোলঃ 216020720

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাদিয়া আক্তার, আইডিঃ 216020720 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nadia

(স্বাক্ষর)

**নাদিয়া আক্তার**

আইডিঃ 216020720

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র

ভূমিকা ..... 5
ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা ..... 6
গণতন্ত্রের উৎপত্তি: ইতিহাসের আলোকে ..... 8
গণতন্ত্র কী ..... 10
গণতন্ত্রের দর্শন ও ভিত্তি ..... 11
গণতন্ত্রের মূল উপাদান ..... 12
গণতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতা ..... 12
ধর্ম ও গণতন্ত্র: একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব ..... 13
ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত ..... 13
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্ব ..... 15
আইন প্রণয়নের ক্ষমতা: আল্লাহর অধিকার বনাম গণতান্ত্রিক দাবি ..... 18
নির্বাচনে সকলের মতামত সমান: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একটি সংঘাতমূলক ধারণা . 21
শূরা বনাম গণতন্ত্র: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ..... 24
খিলাফত ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে পার্থক্য ..... 27
গণতন্ত্র কি ইসলামিক হতে পারে? ..... 28
গণতন্ত্রকে ইসলামিক করতে চাওয়ার ভয়াবহতা ..... 30
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কি খিলাফত কায়েম সম্ভব? ..... 32
উপসংহার ..... 35

# ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আলোকে 'গণতন্ত্র' এবং 'ইসলাম'—এই দুই ধারণার সম্পর্ক নিয়ে বহু বিতর্ক ও আলোচনা চলে আসছে। গণতন্ত্র, যার মূল ভিত্তি হলো জনগণের সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তির স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন, তা আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটি অনিবার্য ধারণা হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা ও আইন অনুযায়ী পরিচালিত করে। ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামোতে শরিয়াহই সর্বোচ্চ আইন এবং আল্লাহই সর্বোচ্চ শাসক। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত' বিষয়ক আলোচনা একটি জটিল এবং স্পর্শকাতর বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো জনগণের অংশগ্রহণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আইনশাসন। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, এবং মানুষকে তার প্রতিনিধিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, গণতন্ত্র যেখানে মানুষের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করে, সেখানে ইসলামী শাসনতন্ত্রে আইন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান, যা পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এই মূল তফাত থেকে জন্ম নেয় ধারণাগত সংঘাত। আবারও, ইসলামে শূরা (পরামর্শ) ও জুমহুর (সমাজের মত) ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নীতির মতো কিছু উপাদান বিদ্যমান, যা এই সংঘাতকে আরও জটিল করে তোলে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে অন্যত্র সংঘর্ষ, উগ্রতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক গণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক দর্শন ইসলামের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিল না থাকার বিষয়টি সংঘাতকে তীব্রতর করেছে। অনেকেই মনে করেন, ইসলামিক শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের নিরিখে মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা ইসলাম ও গণতন্ত্রের নীতিগত ভিত্তি, ইতিহাস, আধুনিক প্রয়োগ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখব যে, সংঘাতটি কতটা গভীর। বর্তমান বিশ্বে এই দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শুধু রাজনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রভাব বিস্তার করে।

## ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা

আজকের মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বুদ্ধিবিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির অন্যতম উৎস হলো — "ইসলাম ও গণতন্ত্রকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা"। অনেকেই অজ্ঞতা, আবেগ অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দাবি করে থাকেন যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক, অথবা গণতন্ত্র ইসলামি কাঠামোরই আধুনিক রূপ! কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইসলাম ও গণতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত — একটি আল্লাহর সার্বভৌমত্বে, অপরটি মানুষের সার্বভৌমত্বে। তাই, এই দু'টি আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং এই দ্বন্দ্বের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা আজকের প্রতিটি ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

১. ঈমান ও আকীদা সংরক্ষণের জন্য

ইসলাম কোনো কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ধর্ম নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে কেবল নামাজ, রোজা নয়, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা, পরিবার—সব কিছু পরিচালিত হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের মূল দর্শন হলো—মানুষই বিধানদাতা। জনগণ চাইলে হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল বানাতে পারে। এটি সরাসরি "আল্লাহর সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ" এবং শিরক ও কুফরীরই আরেক রূপ। তাই এই মতাদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে একজন মুসলিম কখন যে ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, তা সে নিজেই জানবে না।

২. রাজনৈতিক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্য

অনেক ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ও নেতারা "ইসলামী গণতন্ত্র", "ইসলামী সংবিধান", "ইসলামের আলোকে গণতন্ত্র" ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে একটি মিশ্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। অথচ বাস্তবে তা হয় না ইসলাম, না হয় খাঁটি গণতন্ত্র—বরং একটি বিকৃত জগাখিচুড়ি, যার পরিণতি হয় আকীদাহর বিকৃতি ও ইসলামের বদনাম। গণতন্ত্রের নিয়মে নির্বাচন করে যারা খেলাফত কায়েম করতে চায়, তারা নিজেরাই গণতন্ত্রের শপথ ও শর্তে বাঁধা পড়ে ইসলামী লক্ষ্য থেকে সরে যায়। এসব ফাঁদের প্রতিকারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে: ইসলাম ও গণতন্ত্রের পার্থক্য ও সংঘাতের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানা এবং বোঝা।

৩. সেক্যুলারিজম ও পশ্চিমা আধিপত্যের মোকাবেলায়

গণতন্ত্র একটি পশ্চিমা সভ্যতার উৎপাদন—যার জন্ম খ্রিস্টান পাদ্রীদের শোষণ ও ধর্মের বিকৃত ব্যবহারের প্রেক্ষিতে। এরপর তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্মবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই নীতিকে বলা হয় সেক্যুলারিজম। গণতন্ত্র ও সেক্যুলারিজম একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু ইসলাম এমন কোনো বিকৃত ধর্ম নয় যার কারণে তা রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে। বরং ইসলামে ব্যক্তিজীবন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন—সব কিছুই আল্লাহর বিধানের দ্বারা পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে একজন মুসলিম না বুঝেই সেক্যুলার মূল্যবোধকে আপন করে নিতে পারে।

৪.প্রকৃত খেলাফত কায়েমের পথ সঠিকভাবে বোঝার জন্য

অনেকে মনে করেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু ইসলামের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর হুকুমের উপর ভিত্তি করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের উপর নয়। খেলাফতের নেতৃত্ব হতে হবে আল্লাহভীরু, শরিয়াহ-নিষ্ঠ এবং সুন্নাহপন্থী। অথচ গণতন্ত্রে আসতে হলে শপথ করতে হয় তাগুতী সংবিধানে, আপস করতে হয় কুফরী শক্তির সঙ্গে, আর সমর্থন নিতে হয় ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠীর। তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিছক আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়, এবং তা বুঝতে হলে ইসলাম ও গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আবশ্যক।

৫. মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য

আজকের দুনিয়ায় মুসলিম বিশ্ব যতটা না সেনাশক্তিতে দুর্বল, তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল "চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে"। আমাদের অনেক শিক্ষিত শ্রেণি পশ্চিমা গণতন্ত্রকে আদর্শ মনে করে, অথচ ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জানে না। এই বুদ্ধিবিভ্রান্তির কারণে মুসলিম উম্মাহ তাদের স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে, এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। ইসলাম ও গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছাড়া আমরা কোনোদিনও এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারবো না।

ইসলাম ও গণতন্ত্র—দুটি বিপরীতমুখী আদর্শ। একটি আল্লাহর বিধানমাফিক জীবনব্যবস্থা, অন্যটি মানুষের তৈরি এক স্বাধীন মতবাদ। এই সংঘাত নিছক রাজনৈতিক নয়; এটি ঈমান, আকীদা ও চিন্তার গভীর বিভাজন। এই বিষয়টি বোঝা এবং জানার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, আলোচনা, কুরআন-সুন্নাহর অনুসন্ধান, এবং ইতিহাসের পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র জ্ঞানই আমাদেরকে সঠিক চিন্তার দিকে নিয়ে যেতে পারে, ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং ইসলামি খেলাফতের দিকে আমাদের পথ খুলে দিতে পারে।

## গণতন্ত্রের উৎপত্তি: ইতিহাসের আলোকে

গণতন্ত্র—যার অর্থ জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য শাসনব্যবস্থা—আজ একটি আধুনিক বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ধারণা হিসেবে পরিচিত হলেও এর উৎপত্তি ও বিকাশের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ও রক্তাক্ত ইতিহাস। এর শুরু ছিল ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এক আপোষমূলক দর্শনের ওপর, যা ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করে রাজনীতি, আইন ও শাসনকে মানুষের মনগড়া সিদ্ধান্তের হাতে তুলে দেয়।

গণতন্ত্রের উত্থান শুরু হয় মূলত মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও নির্যাতনমূলক আচরণের প্রতিক্রিয়ায়। সেই সময় গির্জা এবং পাদ্রী সম্প্রদায় কেবল ধর্মীয় বিষয়ে নয়, বরং রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা, বিচার এবং সামাজিক জীবনেও প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। তারা নিজেদের 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে দাবি করে মানুষের ওপর আইন চাপিয়ে দিত এবং যে কোনো মতভিন্নতা বা যুক্তিনির্ভর প্রশ্নের জবাবে কঠোর শাস্তি দিত।

এই অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গ্যালিলিও গ্যালিলির মতো একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীকেও ১৬৩৩ সালে তার মতবাদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয়। জিওর্দানো ব্রুনোকে ১৬০০ সালে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় কারণ তিনি মহাবিশ্বের অসীমতা ও বহুবিশ্বের ধারণা দেন। গির্জার কর্তৃত্ব জনগণের জীবনকে এমনভাবে বন্দি করেছিল যে নতুন চিন্তা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও মানবিক বিকাশ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘকালীন নির্যাতনের যুগকে ইউরোপীয় ইতিহাসে “ডার্ক এজ” বলা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইউরোপে শুরু হয় 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ—একটি মননশীল ও সাংস্কৃতিক জাগরণ যা মানুষের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং মানবিক অধিকার

সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে। এই চিন্তার জোয়ারেই গির্জার স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ তৈরি হয়।

এই প্রতিরোধের ফলস্বরূপ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ঘটে যায় একের পর এক বিদ্রোহ ও রক্তাক্ত বিপ্লব—যেমন ইংল্যান্ডে গ্লোরিয়াস রেভল্যুশন (১৬৮৮), ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮৩)। এই বিপ্লবগুলো গির্জা ও রাজতন্ত্রের যুগল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান।

এই সমস্ত বিদ্রোহের পেছনে একটি সাধারণ সূত্র ছিল—ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ক্ষমতার অপব্যবহার। ফলে ইউরোপের চিন্তাবিদ ও দার্শনিকরা সমাধান হিসেবে একটি আপোষমুলক মতবাদ প্রণয়ন করলেন—ধর্ম থাকবে কেবল ব্যক্তিগত জীবনে, কিন্তু রাষ্ট্র চলবে মানুষের বুদ্ধি ও মতামতের ভিত্তিতে। রাষ্ট্রে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। এভাবেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা "Secularism" ধারণার জন্ম হয়।

এই পটভূমিতে "মার্টিন লুথার" গির্জার বিরুদ্ধে ১৫১৭ সালে ৯৫টি অভিযোগ উত্থাপন করে রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু করেন। এর ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র ও গির্জার মাঝে একটি বিভাজনরেখা টেনে দেওয়া হয়। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করে মানুষ নিজেরাই নিজেদের শাসনব্যবস্থা গঠন করে। এই শাসনব্যবস্থাই পরবর্তীকালে "গণতন্ত্র" নামে পরিচিত হয়।

এই প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট যে, গণতন্ত্রের উৎপত্তি একটি সংকটময় বাস্তবতার প্রতিক্রিয়া। এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ, যেখানে মানুষের অভিজ্ঞতা ও যুক্তিকে চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ ইসলামে শাসনের মূলনীতি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর পাঠানো বিধানের অনুসরণ। ইসলামে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, মানুষ কেবল তা বাস্তবায়ন করে।

কুরআন ঘোষণা করে:

* إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ

“ফায়সালার (আইন প্রণয়নের) অধিকার একমাত্র আল্লাহর।”
(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০)

সুতরাং, গণতন্ত্র যেখানে বলে "মানুষই সর্বোচ্চ আইনদাতা", ইসলাম বলে "আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা"। এই বিশ্বাসগত দ্বন্দ্বই ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে মূল সংঘাত তৈরি করে।

গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো—সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতই চূড়ান্ত। কিন্তু ইসলাম বলে—সত্য মাপে সংখ্যায় নয়, বরং আল্লাহর বিধানে। গণতন্ত্র স্বীকার করে ‘মানবীয় ইচ্ছা’কে, আর ইসলাম স্বীকার করে ‘ঐশী নির্দেশ’কে। গণতন্ত্রে আইন পরিবর্তনযোগ্য, সময় ও সমাজের চাহিদায় অভিযোজিত। কিন্তু ইসলামে শরিয়াহ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান—যা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।

তাছাড়া গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে ওঠে একটি বিশেষ সভ্যতার ধর্মীয় বিচ্যুতি ও শোষণের অভিজ্ঞতা থেকে, যা মুসলিম সমাজের অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

## গণতন্ত্র কী

গণতন্ত্র আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি, যার মূল বক্তব্য—“জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, এবং জনগণের শাসন।” এটি শুধুমাত্র একটি শাসনব্যবস্থা নয়, বরং একটি জীবনদর্শন, একটি আদর্শ, যা সমাজে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, মত প্রকাশের অধিকার, এবং মানবিক মর্যাদাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়।

গণতন্ত্র শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ “demokratia”থেকে—”demos” অর্থ ‘জনগণ’ এবং “kratos” অর্থ ‘শাসন’ বা ‘ক্ষমতা’। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে নিহিত, এবং জনগণ সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

# গণতন্ত্রের দর্শন ও ভিত্তি

গণতন্ত্রের দর্শন দাঁড়িয়ে আছে কিছু মৌলিক ধারণার ওপর—যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, আইন ও শাসনের জবাবদিহিতা, জনগণের মতামতের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর। এর মধ্যে অন্যতম হলো "সার্বভৌমত্বের উৎস"—গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ, যাদের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসকেরা ক্ষমতা পায় এবং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এই ভাবধারা পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশে বিশেষভাবে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছে, বিশেষত জন লক, রুশো, হোবস, মিল, ও মঁতেস্কিয়ের মতো দার্শনিকদের মাধ্যমে।

রুশোর "সামাজিক চুক্তি" তত্ত্বে বলা হয়েছে, সমাজ গঠনের জন্য মানুষ পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে কিছু অধিকার রাষ্ট্রকে প্রদান করে এবং রাষ্ট্র জনগণের সম্মতিতে আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য সম্পাদন করে।

জন লক বলেন, জনগণের অধিকার হলো স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা, আর সরকার কেবলই এই অধিকারগুলোর রক্ষক মাত্র।

মিল যুক্ত করেন—মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত বিকাশ গণতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

## গণতন্ত্রের মূল উপাদান

১. নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব: জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

২. আইনের শাসন (Rule of Law): কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়—না শাসক, না নাগরিক। বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে।

৩. মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: নাগরিকরা মত প্রকাশ করতে পারে, সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন তুলতে পারে এবং রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা চেয়ে নিতে পারে।

৪. সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা: সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হলেও গণতন্ত্র সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

৫. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সরকারকে তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

৬. রাজনৈতিক বহুত্ববাদ: ভিন্নমত, ভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আদর্শের সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

## গণতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতা

গণতন্ত্র একক কোন মডেল নয়; এটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন আকারে রূপায়িত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরস্পরের থেকে ভিন্ন। কোথাও প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা, কোথাও পার্লামেন্টারি, কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা কড়াভাবে মানা হয়, আবার কোথাও আংশিক ধর্মীয় প্রভাব গণতন্ত্রের কাঠামোর অংশ। এই বহুরূপতার কারণে অনেক সময় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

গণতন্ত্রের বাস্তবায়নে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে—যেমন, সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা (majoritarianism), জনমতের মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়ের বিভাজন, অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে

তৈরি রাজনৈতিক প্রভাব, এবং নির্বাচিত শাসকদের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ। এইসব সীমাবদ্ধতা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং অনেক সমাজে বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধানকে উৎসাহিত করে।

## ধর্ম ও গণতন্ত্র: একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব

গণতন্ত্র মূলত ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে বিকশিত হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন থাকে। এই ধর্মনিরপেক্ষতা কখনো কখনো ধর্মীয় অনুশাসনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ধর্ম যেখানে কিছু  বিধানকে চূড়ান্ত হিসেবে ধরে নেয়, সেখানে গণতন্ত্রে 'জনগণের ইচ্ছা'ই নীতিনির্ধারণের সর্বোচ্চ উৎস। ফলে ধর্মভিত্তিক সমাজে গণতন্ত্রের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে—কোন বিধান চূড়ান্ত? জনগণের ইচ্ছা, নাকি সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আইন?

এই জায়গাটিই "ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত" শিরোনামের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে তার নিজস্ব নীতিমালা ও শাসনতন্ত্রের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে, যেখানে আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম। সুতরাং, একটি ধর্মীয় নীতিনির্ভর সমাজব্যবস্থা এবং একটি জনগণ-নির্ভর শাসনব্যবস্থার মধ্যে সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।

## ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের প্রতিটি দিক—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালায় গঠিত। অন্যদিকে গণতন্ত্র মানুষের তৈরি একটি শাসনব্যবস্থা, যার ভিত্তি মানুষের ইচ্ছা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতের ওপর। ফলে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত ও আদর্শিক পার্থক্য রয়েছে। নিচে এই পার্থক্যগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো:

1. সার্বভৌমত্বের উৎস

ইসলাম: একমাত্র আল্লাহই সার্বভৌম; আইন প্রণয়নের পূর্ণ কর্তৃত্ব আল্লাহর।

গণতন্ত্র: সার্বভৌমত্ব জনগণের; আইন তৈরি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

2. আইন প্রণয়ন

ইসলাম: কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে আইন নির্ধারিত হয়।
গণতন্ত্র: সংসদ বা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আইন পাস হয়, তা শরিয়াহ-বিরোধী হলেও।

3. নেতৃত্ব নির্বাচনের মানদণ্ড

ইসলাম: তাকওয়া, ইলম, আমানতদারি ও ন্যায়ের যোগ্যতা অপরিহার্য।
গণতন্ত্র: জনপ্রিয়তা, প্রচারণা, অর্থ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটই নির্ধারক।

4. ভোটের মূল্য

ইসলাম: মতামতের ওজন ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল।
গণতন্ত্র: সব নাগরিকের ভোটের মূল্য সমান, জ্ঞানী-মূর্খ, ধার্মিক-অধার্মিক ভেদ নেই।

5. শরিয়াহ ও জনগণের ইচ্ছা

ইসলাম: শরিয়াহ সর্বোচ্চ, জনগণ তার অধীন।
গণতন্ত্র: জনগণের ইচ্ছা সর্বোচ্চ, শরিয়াহ মানা ঐচ্ছিক বা অপ্রাসঙ্গিক।

6. ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

ইসলাম: ধর্ম ও রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য।
গণতন্ত্র: ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব নিষিদ্ধ।

7. পাপ ও অপরাধের সংজ্ঞা

ইসলাম: আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা চিরতরে হারাম।
গণতন্ত্র: জনমতের ভিত্তিতে পাপকে বৈধতা দেওয়া যায় (যেমন: সমকামিতা, সুদ)।

8. মূল আদর্শের উৎস

ইসলাম: আল্লাহপ্রদত্ত অহী ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ।
গণতন্ত্র: মানুষের তৈরি দর্শন (সেক্যুলারিজম, মানবতাবাদ ইত্যাদি)।

9. শাসকের কর্তব্য

ইসলাম: শাসকের দায়িত্ব আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা।
গণতন্ত্র: শাসকের দায়িত্ব জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা।

10. শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য

ইসলাম: আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সফলতা।
গণতন্ত্র: দুনিয়াবি শান্তি, ভোগ ও জনগণের সন্তুষ্টি।

## আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্ব

মানবজাতির ইতিহাসে "কে শাসন করবে, কী নিয়মে শাসন হবে"—এই প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাববিস্তারকারী। এই প্রশ্নের উত্তরেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা: রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, খিলাফত, স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতি। কিন্তু ইসলামী চিন্তাধারায় এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সুস্পষ্ট: "হুকুম কেবলমাত্র আল্লাহর" (সূরা ইউসুফ: ৪০)। পক্ষান্তরে আধুনিক গণতন্ত্রে বলা হয়, "শক্তি ও কর্তৃত্বের উৎস জনগণ।" এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো সার্বভৌমত্বের উৎসে—"আল্লাহ নাকি জনগণ?"এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য শুধু বিশ্বাসের নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দিক নির্ধারণ করে দেয়।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) অর্থ:

* সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব
* সিদ্ধান্তের শেষ কথা
* প্রশ্নাতীত আদেশ ও বিধান প্রণয়নকারী সত্তা

ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকার।

ইসলামী আকিদায় বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেবল সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নন, বরং তিনি একমাত্র আইনদাতা ও বিধানপ্রণেতা। তিনি কেবল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা নন, বরং তিনিই হালাল-হারাম নির্ধারণকারী, ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞাদাতা, এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিধানদাতা।তিনি মানবজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বিধান দিয়েছেন—ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ-বিষয়ক নীতি—সবই অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন এ বর্ণিত-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"হুকুম (আইন প্রণয়ন) কেবল আল্লাহর।" (সূরা ইউসুফ: ৪০)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফির।" (সূরা মায়েদা: ৪৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তার কামনা-বাসনা আমার আনা শরিয়তের অধীন হয়।" (মুস্তাদরাক হাকিম)

এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকে সরাসরি কুফরী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

গণতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি হলো "Popular Sovereignty" অর্থাৎ "জনগণই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস"। জনগণ যাকে ক্ষমতা দেবে, সে-ই আইন প্রণয়ন করবে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে যেকোনো কিছু বৈধ বা অবৈধ ঘোষণা করতে পারে।

জন লক ও রুশোর মতে: "আইন সৃষ্টি ও শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনগণের হাতে।"
ফলে ধর্মীয় বিধান এখানে বাধ্যতামূলক নয়, বরং ঐচ্ছিক।

গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা হয়, জনগণই রাষ্ট্রের মালিক এবং আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ উৎস। সংসদ, পার্লামেন্ট, বা গণভোটের মাধ্যমে জনগণ ঠিক করবে কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ।

"Democracy is the government of the people, by the people, for the people." — Abraham Lincoln

ফলে জনগণ যদি চায় সমকামিতা বৈধ হোক, তাহলে তা আইনি হয়ে যায়। জনগণ যদি চায় সুদ চালু থাকুক, তাহলে তা বৈধতা পায়।
কোনো বিষয় কুরআনে হারাম হলেও সংসদে তা বৈধ হতে পারে।

খিলাফতপন্থী মুসলিম বিশ্বে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিল স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত। কিন্তু ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর পশ্চিমা ধারণায় গঠিত প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র মুসলিম বিশ্বে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে দেখা যায়:

* কুরআন-সুন্নাহকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি সংবিধান অনুসরণ শুরু হয়।
* ধর্মকে সীমাবদ্ধ করা হয় ব্যক্তিগত ইবাদত পর্যন্ত।
* রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে আল্লাহর বিধান অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্ব—এই দুই দর্শন একই সঙ্গে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী আকিদা বলে:

* কেবল আল্লাহর হুকুম চলবে।
* আইন প্রণয়ন একমাত্র আল্লাহর কাজ।
* শাসকের দায়িত্ব হলো এই হুকুম বাস্তবায়ন করা।

গণতান্ত্রিক দর্শন এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর স্থানে জনগণকে বসিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো:

* আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ঈমান আনা,
* এবং জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সবক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

## আইন প্রণয়নের ক্ষমতা: আল্লাহর অধিকার বনাম গণতান্ত্রিক দাবি

ইসলামী দর্শনে 'হুকুম' বা শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জানেন কোন বিধান মানুষ ও সমাজের কল্যাণে উপযোগী। ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস হলো—**"আইন প্রণয়ন একমাত্র আল্লাহর অধিকার"**। মানুষ তার নিজ ইচ্ছা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্ধারণ করতে পারে না।

কুরআন বহুবার এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে:

"إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"আসলে আইন প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।" (সূরা ইউসুফ: ৪০)

"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"তারা কি এমন শরীক স্থাপন করেছে, যারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শরিয়াহ নির্ধারণ করেছে?" (সূরা আশ-শূরা: ২১)

এই আয়াতগুলো ইসলামে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আইন তৈরি করার অধিকার শুধু সেই সত্তার, যিনি সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ **আল্লাহ**। কোনো ব্যক্তি, সংসদ, প্রতিষ্ঠান বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মত এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও ছিলেন কেবল "বিধান প্রচারকারী ও ব্যাখ্যাকারী", নতুন আইনদাতা নয়। আল্লাহ তাঁকে বলেন:

"فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ

"তুমি তাদের মধ্যে বিচার করো যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী।" (সূরা মায়েদা: ৪৮)

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে "শাসকের কাজ হলো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা", নতুন বিধান তৈরি করা নয়।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো—"Law is made by the people, for the people." অর্থাৎ, জনগণই আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত উৎস ও মালিক। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে কোনো আইন তৈরি বা বাতিল করা যায়—even if it contradicts divine or moral principles.

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য:

* মানুষ নিজেদের মত করে আইন তৈরি করে
* ধর্মীয় বিধান মানার বাধ্যবাধকতা নেই
* হালাল-হারাম নির্ধারিত হয় সমাজের প্রবণতা অনুযায়ী
* পার্থিব জীবন আলাদা, ধর্মীয় জীবন আলাদা (Secularism)

খুলাফায়ে রাশিদীন যুগে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়নি; কেবল আল্লাহর বিধানকে বাস্তব প্রয়োগ করা হয়েছে শূরার মাধ্যমে।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইজতিহাদের মাধ্যমে কিছু নতুন প্রয়োগিক নির্দেশনা দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলো মূল শরিয়াহর পরিপন্থী ছিল না।

অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক ইউরোপে দেখা যায়—ধর্মকে রাজনীতি ও আইন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্যে গর্ভপাত বৈধ হয়; ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডসে সমকামী বিয়ে বৈধ হয়—সবই জনগণের রায় বা সংসদের ভোটে।

ইসলাম মানুষের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অস্বীকার করে।

কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ"

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি ভালো জানেন না?" (সূরা মুলক: ১৪)

ইসলামের মতে, মানুষের জ্ঞান সীমিত, পক্ষপাতদুষ্ট ও স্বার্থান্বেষী। তাই মানুষ কখনোই এমন আইন তৈরি করতে পারে না যা সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই। আল্লাহর আইনই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ, ন্যায়সঙ্গত এবং সর্বজনীন।

ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা ঈমানের অংশ। যদি কেউ মনে করে যে মানুষ আল্লাহর শরিয়াহ বাদ দিয়ে নিজে নিজে আইন বানাতে পারে, তবে সে ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে পারে। কারণ কুরআনে বর্ণিত আছে,

"أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ"

"তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কে আছে?" (সূরা মায়েদা: ৫০)

আল্লাহর দেওয়া আইন সর্বশ্রেষ্ঠ, চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। গণতন্ত্রে মানুষ নিজেদের মত করে আইন তৈরি করে, পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনে ধর্মীয় মূল্যবোধকেও বাতিল করে দেয়। এই দুই দর্শনের মূল সংঘাত এখানেই— "কর্তৃত্বের উৎস": আল্লাহ না মানুষ?

একজন মুসলমানের জন্য গ্রহণযোগ্য কেবল একটিই ব্যবস্থা— "যেখানে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব আল্লাহর", এবং মানুষ সেই আইনের অনুগামী। এটাই ইসলামের প্রকৃত আকীদা, এবং এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করা শুধু একটি রাজনৈতিক ভুল নয়, বরং ঈমানী বিচ্যুতি।

## নির্বাচনে সকলের মতামত সমান: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একটি সংঘাতমূলক ধারণা

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো— "একজন মানুষ, এক ভোট" নীতি। এখানে ব্যক্তির ধর্ম, নৈতিকতা, চরিত্র, জ্ঞান কিংবা বিচক্ষণতা বিবেচনায় না নিয়ে তার ভোটের মূল্যকে অপরিবর্তনীয় ও সমান ধরে নেওয়া হয়। একজন মূর্খ ব্যক্তি ও একজন জ্ঞানী আলেমের মতামত একই ওজন পায়। পক্ষান্তরে ইসলাম শাসনব্যবস্থায় মতামতের মূল্যায়ন করা হয় যোগ্যতা, তাকওয়া, জ্ঞান এবং ন্যায়বোধের ভিত্তিতে। এই দুটি দর্শনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ইসলামী ও গণতান্ত্রিক মতবাদকে সাংঘর্ষিক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

—

গণতন্ত্রের মূল কথা হলো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। তাই সকল নাগরিকের সমান ভোটাধিকার থাকবে। এতে—

* একজন মাদকাসক্ত, ধর্মবিদ্বেষী ব্যক্তির মতামত এবং একজন আল্লাহভীরু, দ্বীনদার ও জ্ঞানী আলেমের মতামত সমান বিবেচিত হয়।

* কোন বিষয় হালাল হবে না হারাম হবে তা নির্ধারণ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে।

* সত্য-মিথ্যার বিচার নয়, বরং সংখ্যার খেলাই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধারণা, বাস্তবতার নিরিখে অনেক সময় চূড়ান্ত অন্যায় ও বোকামিপূর্ণ সিদ্ধান্তেও পৌঁছায়, যেমন:

* অধিকাংশ যদি সমকামিতাকে বৈধ মনে করে, তাহলে তা বৈধ হয়ে যায়।
* অধিকাংশ যদি শরিয়া না চায় , তাহলে শরিয়া বাতিল হয়ে যায়।

ইসলামে মতামতের মূল্যায়ন হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে।

ইসলামে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের অধিকার **সকলের নয়**, বরং এটি আমানত, যা কেবল যোগ্যদেরই প্রাপ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

" إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِه فانتظرِ الساعة"

"যখন কোনো দায়িত্ব অযোগ্যদের হাতে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।" (বুখারি: ৬৪৯৬)

ইসলামে শূরা ব্যবস্থায় শূরা (পরামর্শ) করা হয় যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে। সাহাবায়ে কেরামদের যুগে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ নিতেন খুশু-খুশু সবাই নয়, বরং মুহাজির-আনসার, জ্ঞানী সাহাবী ও চিন্তাশীলরা। খিলাফত নির্বাচনে বা যুদ্ধনীতি নির্ধারণে অংশ নিতেন সমাজের দায়িত্বশীল, পরীক্ষিত মানুষ।

ইসলামের দৃষ্টিতে মতামতের ওজন নির্ধারণ হয়:

১.তাকওয়া ও দ্বীনদারতা
২. ইলম (জ্ঞান)
3. তাজরিবা (অভিজ্ঞতা)
4. আখলাক ও ন্যায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতি

এভাবে ইসলাম ভোটের সমতা নয়, বরং “মর্যাদার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ”কে উৎসাহিত করে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে একজন অজ্ঞ, চরিত্রহীন বা স্বার্থান্ধ ব্যক্তি যেমন ভোট দিতে পারে, তেমনি একজন পরহেযগার মুফতিও ঠিক সমান ভোট দিতে পারেন। বহু দেশে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম বা ধর্মবিমুখদের কারণে আইনসঙ্গত হয়নি, বরং তারা শরিয়া-বিরোধী আইন বাস্তবায়ন করেছে।

গণতন্ত্রের সমান মতামত নীতির বিপদ হলো-

১. সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মুছে যায়। "সত্য" হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়।

২. ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ হয়। জনমত যদি শরিয়া না চায়, তবে তা বাতিল।

৩. অযোগ্য ব্যক্তির শাসনে সমাজ বিপর্যস্ত হয়। নেতৃত্ব চলে যায় দুর্নীতিবাজ, জনদরবিরহীন ব্যক্তির হাতে।

এ বিষয়ে  ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট।

ইসলাম বলে:

"أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ"

"যিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন, তাঁকে অনুসরণ করবে, না তাকে যিনি পথপ্রদর্শন পায় না যতক্ষণ না তাকে পথ দেখানো হয়?" (সূরা ইউনুস: ৩৫)

খিলাফায়ে রাশেদার যুগে নেতৃত্ব নির্বাচন:

* আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় 'আহলে হাল ওয়াল আকদ' তথা অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ সাহাবীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়।
* হযরত উমর (রাঃ) তার পরে ছয়জন নির্বাচিত সাহাবীকে দায়িত্ব দেন খলিফা বাছাইয়ের জন্য, যাদের সকলেই ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী, তাকওয়াবান, আল্লাহভীরু ও বিশ্বস্ত।
* সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি; বরং তাদের দায়িত্ব ছিল যোগ্য নেতার প্রতি বায়আত বা আনুগত্য প্রদান।

আন্দালুস বা উমাইয়া যুগে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও শরিয়াহ কার্যকরের দায়িত্বে ছিলেন আলেম, ফকীহ ও মুজতাহিদগণ। কেউ মসজিদের মুয়াযযিন হতে চাইলে তাকওয়া ও শুদ্ধ কিরআত পরীক্ষা হতো, সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য কেবল জনপ্রিয়তা নয়, বরং ইলম ও আমলের ভিত্তিতে বাছাই হতো।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সকলের মতামতের সমান মূল্য ইসলামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম সত্য, জ্ঞান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণের কথা বলে; পক্ষান্তরে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের উপর রাষ্ট্রীয় নীতিমালা নির্ধারণ করে। ফলত, সত্য অনেক সময় চাপা পড়ে যায়, আর অন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায় বৈধতা।

একজন মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর বিধানের বাইরে কোন রকম শাসনব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বা পূর্ণাঙ্গ বলে গ্রহণ না করা। গণতন্ত্রের এই "সমান ভোট" ধারণা, বাস্তবিক অর্থে, ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং কুফরীর দরজার দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি তা ঈমান ও শারঈ বিধানের পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়।

## শূরা বনাম গণতন্ত্র: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন ও পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পার্থক্য হলো 'শূরা' ও 'গণতন্ত্র' (Democracy)। উভয় ধারণার মধ্যে কিছু বাহ্যিক মিল থাকলেও মূল দর্শন, কর্তৃত্বের উৎস, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দিক থেকে এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। ইসলামে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হলো "শূরা", যা একটি ধর্মীয় নির্দেশনা ও নৈতিক দায়িত্ব। অপরদিকে, আধুনিক গণতন্ত্র একটি মানবকেন্দ্রিক ব্যবস্থা, যেখানে "সকল ক্ষমতার উৎস গণমানুষ", তাদের ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

'শূরা' শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "شورى" থেকে, যার অর্থ পারস্পরিক পরামর্শ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:

" وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"

“তুমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর কাজের ব্যাপারে।” (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

এছাড়াও, সূরা শূরার ৩৮ নম্বর আয়াতে শূরাকে মুসলিম সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

" وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ"

“তাদের কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি—এইসব সিদ্ধান্ত ছিল শূরার ফল। খোলাফায়ে রাশিদীন যুগেও শূরা ছিল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের অপরিহার্য অংশ। তবে এসব সিদ্ধান্ত কখনোই আল্লাহর বিধান অমান্য করে হয় নি।

অন্যদিকে গণতন্ত্র একটি পশ্চিমা রাজনৈতিক ধারণা, যার মূল বক্তব্য হলো—“জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস” এবং “সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।” গণতন্ত্রের আদর্শে আইন প্রণয়নকারী হচ্ছে সাধারণ মানুষ বা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। জনগণ চাইলে যেকোনো আইন পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে—এমনকি আল্লাহর বিধানও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন না পায়, তাও সমাজে প্রযোজ্য হবে না।

খলিফা আবুবকর (রা.) থেকে শুরু করে চার খলিফার শাসনকালে শূরা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। তবে কখনোই এই পরামর্শ কুরআন-সুন্নাহর সীমা অতিক্রম করেনি। উদাহরণস্বরূপ, খলিফা উমর (রা.) একটি প্রস্তাবকে জনগণের দাবির কারণে গ্রহণ করেননি, যেটি শরিয়াহর মূলনীতির পরিপন্থী হতে পারত।

অন্যদিকে, গণতন্ত্রের ইতিহাস এমন বহু উদাহরণে ভরা যেখানে সমাজ সংখ্যাগরিষ্ঠের নামে ইসলাম ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন: সমকামিতার বৈধতা, মদ ও সুদের বৈধতা, পর্নোগ্রাফি ও নগ্নতার ‘অধিকার’ ইত্যাদি—সবই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে আইনি বৈধতা পেয়েছে।

শূরা একটি ইবাদত, যেখানে পরামর্শের মধ্য দিয়ে কল্যাণের পথ অন্বেষণ করা হয় আল্লাহর বিধানের আলোকে। গণতন্ত্র হলো একটি মানবকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই চূড়ান্ত সত্যে পরিণত হয়—তা যতই অন্যায়, অবিচার বা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী হোক না কেন।

শূরার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান সর্বোচ্চ, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের মত সর্বোচ্চ। এখানেই এ দু'য়ের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এবং সংঘাত।

শূরা ও গণতন্ত্র—দুইটি পরামর্শমূলক শব্দ হলেও একটির ভিত্তি হলো "রবকেন্দ্রিক তাওহিদী চেতনা", অপরটি হলো "মানবকেন্দ্রিক স্বাধীনতা চেতনা"। একটিতে পরামর্শের সীমা শরিয়াহ দ্বারা নির্ধারিত, অপরটিতে আইন তৈরিই জনগণের অধিকার।

অতএব, যে কোনো মুসলিম সমাজে যখন গণতন্ত্রকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা কেবল ভুল ধারণা নয়, বরং ঈমানি চেতনার ওপর এক গভীর আঘাত। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা কেবল আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শূরা ভিত্তিক হতে পারে—নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র ভিত্তিক নয়।

শূরা এবং গণতন্ত্র দুইটি ভিন্ন জীবনদর্শনের প্রতিফলন। একটি ঐশী নির্দেশনাভিত্তিক, অপরটি মানবকেন্দ্রিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে কেবল শাসনব্যবস্থা নয়, বরং নৈতিকতা, সমাজ, অর্থনীতি এবং বিচারব্যবস্থার সমন্বিত রূপরেখা দেয়। সেখানে শূরা একটি উপাদান হিসেবে কাজ করে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে, গণতন্ত্রের মতো বিকল্প কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে নয়। অতএব, ইসলাম ও গণতন্ত্রের সংঘাত একটি কাকতালীয় বিভ্রান্তি নয়, বরং মূল দর্শনের স্তরেই এদের মাঝে রয়েছে মৌলিক দ্বন্দ্ব।

# খিলাফত ও প্রজাতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হলো **খিলাফত** ও **প্রজাতন্ত্র (Republic/Democracy)**। যদিও উভয় ব্যবস্থায় শাসকের নির্বাচন, জনকল্যাণ ইত্যাদি কিছু বাহ্যিক মিল আছে, তবে ভিতরগত কাঠামো, দর্শন, উৎস ও উদ্দেশ্যে এ দুই শাসনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য।

খিলাফতে সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর। খলিফা নিজে আইনদাতা নয়, বরং তিনি আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী মাত্র। পক্ষান্তরে প্রজাতন্ত্রে জনগণই আইন প্রণেতা এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত উৎস। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে যেকোনো আইন পাস বা বাতিল করা যায়, এমনকি তা যদি আল্লাহর বিধানের পরিপন্থীও হয়।

খিলাফায় শাসকের প্রধান যোগ্যতা হলো "দীনদারি, ন্যায়পরায়ণতা, শরিয়াহ জ্ঞান" এবং সমাজের ওপর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু গণতন্ত্রে শাসকের প্রধান যোগ্যতা হলো "ভোট পাওয়ার সক্ষমতা" – তা সে প্রতিশ্রুতি, মিডিয়া প্রভাব বা পপুলার স্লোগান দিয়েই হোক।

খিলাফাতে আইন আসে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে। খলিফার নিজস্ব কোনো আইন করার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে গণতন্ত্রে আইন তৈরি হয় মানুষের চাহিদা, সংস্কৃতি, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ভোটের ভিত্তিতে।

উদাহরণস্বরূপ:

* খিলাফাতে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গণতন্ত্রে সুদ রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ।
* খিলাফাতে সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গণতন্ত্রে এটি "মানবাধিকারের" অংশ হিসাবে বৈধ।

## গণতন্ত্র কি ইসলামিক হতে পারে?

ইসলাম একটি আসমানী জীবনব্যবস্থা—যার প্রতিটি দিক নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাঁর কিতাব ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহর মাধ্যমে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র একটি মনুষ্যনির্মিত ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হলো জনগণের মতামত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত। এই দুই দর্শনের মধ্যে মৌলিক ও বুনিয়াদি পার্থক্য এতটাই গভীর যে, এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা শুধু অসম্ভবই নয়, বরং বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। নিচে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো-

১. সার্বভৌমত্বের উৎসে দ্বন্দ্ব

ইসলামে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি বলেন:

"সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।" — (সূরা ইউসুফ: ৪০)

অথচ গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের উৎস জনগণ। জনগণ যা চায়, তা-ই আইন; তারা যাকে চায়, সে-ই শাসক। এই দর্শনে আল্লাহর বিধান মানুষ চাইলে মানবে, না চাইলে বাতিল করবে। এটা সরাসরি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি বিদ্রোহ।

২. আইন প্রণয়নের অধিকার

ইসলামে আইন প্রণয়ন শুধু আল্লাহর অধিকার। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও কোনো বিষয়ে অহী ব্যতীত সিদ্ধান্ত দিতেন না। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আইন তৈরি করে সংসদ বা পার্লামেন্ট, যেখানে সেক্যুলার চিন্তা ও ধর্ম-বিমুখ রাজনীতি প্রধান। ইসলাম বলে, হারামকে হালাল করা কুফরি; কিন্তু গণতন্ত্র বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ চাইলে হারামও হালাল হয়ে যেতে পারে।

৩. ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র একীভূত। নবী ﷺ মদিনায় রাষ্ট্র গঠন করে নিজেই এর প্রধান হন এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করেন। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র সেক্যুলার; সেখানে ধর্ম শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র চালিত হয় মানুষ রচিত নিয়মে, যেখানে আল্লাহর বিধানের স্থান নেই।

৪. ভোটের সমতা ও ন্যায়বিচার

গণতন্ত্রে সব ভোট সমান—একজন মদ্যপ ও একজন আলেমের ভোটের মূল্য এক। ইসলাম এই সমতার ভিত্তিতে শাসক নির্বাচনের অনুমোদন দেয় না। ইসলাম বলে, নেতৃত্ব কেবল তাকওয়া, ইলম ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, জনপ্রিয়তা বা জনসংখ্যার ওপর নয়।

৫. ইসলামের নামে গণতন্ত্র: এক আত্মপ্রতারণা

আজকে কেউ কেউ 'ইসলামী গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে এ দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদকে মিলিয়ে দিতে চান। কিন্তু এটি মূলত এক আত্মপ্রতারণা। ঠিক যেমন 'ইসলামী মদ' বা 'ইসলামী সুদ' হতে পারে না, তেমনি 'ইসলামী গণতন্ত্র'ও এক অক্সিমোরন। এটি ইসলামের নির্ভেজাল আকীদা ও শাসনব্যবস্থাকে ভূলুণ্ঠিত করে পশ্চিমা মতবাদের সঙ্গে আপোষ করার এক ছলচাতুরী।

৬. ইতিহাস যা বলে

ইতিহাস সাক্ষী যে, যেসব মুসলিম শাসক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পশ্চিমা প্রভুদের ইচ্ছা বাস্তবায়নেই ব্যস্ত থেকেছেন। কারণ গণতন্ত্রের কাঠামোই এমন, যা শরিয়াহ-ভিত্তিক শাসনকে প্রতিহত করে। মিসরের মুহাম্মদ মুরসী কিংবা তুরস্কের এরদোয়ান—প্রথমে ইসলামি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গণতন্ত্রে প্রবেশ করলেও বাস্তবে পশ্চিমা সেক্যুলার কাঠামোর বাইরে বের হতে পারেননি।

৭. খিলাফতের পরিপূর্ণতা বনাম গণতন্ত্রের বিভ্রান্তি

ইসলামে "খিলাফত" একটি পরিপূর্ণ ও ঐশী অনুমোদিত শাসনব্যবস্থা। খিলাফতের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর শরিয়াহর বাস্তবায়ন। সেখানে শূরা আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত সর্বদা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে। গণতন্ত্রে মতামতই চূড়ান্ত। তাই এই দুটি ধারণার মধ্যে আপোষ করলেই ঈমানের মৌলিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গণতন্ত্র ও ইসলাম—দুইটি পরস্পরবিরোধী আদর্শ। একটি মানুষের ইচ্ছার পূজারি, অন্যটি আল্লাহর বিধানের বশ্যতা। যারা ইসলামকে পূর্ণতা সহকারে মানে, তাদের জন্য গণতন্ত্র গ্রহণ

করা বিশ্বাসঘাতকতা। তাই বলা যায়, “গণতন্ত্র কখনও ইসলামিক হতে পারে না”, এবং যারা এই দুটিকে একত্রিত করার চেষ্টা করে, তারা হয় ইসলামকে বোঝে না, নয়ত বোঝেও উপেক্ষা করে।

## গণতন্ত্রকে ইসলামিক করতে চাওয়ার ভয়াবহতা

বর্তমান সময়ে অনেকেই ইসলামকে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি তথাকথিত “ইসলামী গণতন্ত্র” গঠনের চেষ্টা করছেন। তারা মনে করেন, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ইসলামি আদর্শে রূপান্তর করা সম্ভব। বাস্তবতা হলো, এ প্রচেষ্টা শুধু অবাস্তব নয়, বরং ভয়াবহ আত্মপ্রতারণা ও ঈমান-সংক্রান্ত গুরুতর বিপদের দিকে ধাবিত করে।

১. দ্বীনকে বিকৃত করা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি..." (সূরা আল-মায়িদা: ৩)

যে দ্বীন আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ করেছেন, সেখানে মানুষের বানানো শাসনব্যবস্থা জুড়ে দেওয়ার অর্থ হলো সেই পূর্ণতায় ঘাটতি দাবি করা। এটি স্পষ্টতই কুফরির সন্নিকটে পৌঁছানো এক ধৃষ্টতা। যারা গণতন্ত্রকে ইসলামিক করতে চান, তারা মূলত দ্বীনের কাঠামোতেই পরিবর্তন আনতে চান।

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্বে আঘাত

গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো “জনগণই আইনদাতা”, পক্ষান্তরে ইসলামে আইনদাতা একমাত্র আল্লাহ। গণতন্ত্রকে ইসলামিক করার মানে হলো, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পাশে জনগণের সার্বভৌমত্বকে দাঁড় করানো। এটি শিরকপূর্ণ একটি ধারণা, কারণ শরীয়ত নির্ধারণে কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো শিরকেরই একটি রূপ।

৩. পশ্চিমা প্রভুদের মানসিক দাসত্ব

যারা ইসলামকে গণতন্ত্রে রূপান্তর করতে চান, তারা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক দাসত্বে আবদ্ধ। তারা ইসলামকে পশ্চিমের কাঠামোয় মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু পশ্চিমের কাঠামোকে ইসলামে আনতে চান না। এই মনোবৃত্তি জন্ম দেয় আত্মপরাজিত এক মুসলিম সত্তা, যারা কুরআনের স্পষ্ট আদেশকে পাশ কাটিয়ে তাগুতের রীতিকে "আধুনিকতা"র নামে গ্রহণ করে।

৪. মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা

গণতন্ত্রকে ইসলামিক নামে চালিয়ে দেওয়া এক প্রতারণা, যার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের বুঝানো হয় যে, ভোট, সংসদ, পার্টি-পলিটিক্স, সংবিধান—এ সব কিছু ইসলামিক করা সম্ভব।. কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই ব্যবস্থা ইসলামের মূল রুহ ও আকীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এতে মানুষ ইসলামের নামে আসলে ইসলামবিরোধী মতবাদের ভেতর ঢুকে পড়ে, যা তাদের ঈমানকে হুমকির মুখে ফেলে।

৫. ইতিহাসের শিক্ষা: ব্যর্থতা ও প্রতারণা

ইতিহাসে দেখা গেছে, ইসলামি গণতন্ত্রের নামে যারা ক্ষমতায় এসেছে, তারা শরীয়াহকে অগ্রাধিকার দিতে পারেনি। মিসরে মোহাম্মদ মুরসী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধা হিসেবে গণতন্ত্রের আইনি কাঠামোই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তুরস্কে এরদোয়ানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। ধর্মের নাম করে ভোট চাওয়া হয়, ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী বিধানের বদলে সেক্যুলার সংবিধানই কার্যকর রাখা হয়। এটা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং দ্বীনের সঙ্গে প্রতারণা।

৬. ইসলাম বিকৃতির দ্বার উন্মোচন

গণতন্ত্রকে ইসলামিক করতে গেলে ইসলামী বিধানগুলোকে গণতন্ত্রের কাঠামোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। ফলে ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিধানগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, শরিয়া অনুযায়ী কোনো বিষয়ের হালাল বা হারাম নির্ধারিত হলেও, গণতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে। এটি দ্বীনের শাশ্বততা ও স্থায়িত্বকে বিনষ্ট করে।

গণতন্ত্রকে ইসলামিক করার চেষ্টার ভয়াবহতা শুধু ঈমানের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়, বরং তা গোটা উম্মাহকে বিভ্রান্ত, দুর্বল ও পরাজিত করার অন্যতম অস্ত্র। আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ, এর সঙ্গে কোনো মানব-নির্মিত মতবাদ মিশিয়ে দেওয়ার মানেই দ্বীনের বিকৃতি। ইসলামী নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কেবলমাত্র খিলাফত ও শরিয়াহ-নির্ভর শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব—গণতন্ত্রের ভেতরে থেকে নয়।

## গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কি খিলাফত কায়েম সম্ভব?

আজকাল অনেকেই মনে করেন, ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে—অর্থাৎ রাজনৈতিক দল গঠন, নির্বাচন, সংসদ ও ভোটের মাধ্যমে—স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, গণতন্ত্র ও খেলাফত সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটির ভিত্তি মানুষের মতামত ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অপরটির ভিত্তি আল্লাহর বিধান ও অহির নির্দেশনা। গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থেকে খেলাফত কায়েম করার চেষ্টাই মূলত আত্মপ্রতারণা ও দ্বীনের মৌলিক রূপরেখাকে বিকৃত করার সামিল। এর কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. খিলাফতের ভিত্তি: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শরিয়াহ

খিলাফতের মৌলিক ভিত্তি হলো "আল্লাহর সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of Allah)"। ইসলামী খেলাফতব্যবস্থায় খলীফা বা আমীরুল মু'মিনীন জনগণের প্রতিনিধি মাত্র, আইন প্রণেতা নন। শরিয়াহ বা আইন নির্ধারণের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। কুরআন ও হাদীসই রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ সংবিধান। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষের হাতে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

কুরআনে বলা হয়েছে,

“ফয়সালা কেবলমাত্র আল্লাহরই...” (সূরা ইউসুফ: ৪০)

“তারা কি এমন শরীক দাঁড় করিয়েছে, যারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যা আল্লাহ নির্দিষ্ট করেননি?” (সূরা আশ-শূরা: ২১)

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, ইসলামে আইন প্রণয়ন ও শাসনব্যবস্থা কেবল আল্লাহর নির্দেশনানুযায়ী হতে পারে। গণতন্ত্রের ভিতর থেকে এ আদর্শ কখনো কায়েম করা সম্ভব নয়।

২. গণতন্ত্রের পদ্ধতি: জনমতের পূজা

গণতন্ত্রে সবকিছু নির্ধারিত হয় মানুষের ইচ্ছা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি কোনো হারাম কাজকে হালাল ঘোষণা করে, তবে সেই মতই কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে ইসলামি খেলাফতে শরীয়াহর বাইরে কোনো সিদ্ধান্তই বৈধ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামী দলগুলো যখন গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে গিয়েছিল, তখন তারাও একসময় গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার শিকার হয়েছে। ইসলামি আদর্শকে বাস্তবায়নের চেয়ে নির্বাচন ও জোট গঠনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেমন:

* “মিসরের মুরসি সরকার” গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।
* “তুরস্কে এরদোয়ান” বারবার ইসলামি রেফারেন্স ব্যবহার করলেও তার সরকার তুর্কি সংবিধান থেকে “সেক্যুলারিজম” বাদ দিতে পারেনি।

৩. ইসলাম ও গণতন্ত্রের মতাদর্শিক সংঘর্ষ

খিলাফত ও গণতন্ত্র দুই ভিন্ন আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে আছে:

- খিলাফতে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। অন্যদিকে গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের।
- খিলাফতে আইন প্রণয়ন হয় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে আইন প্রণিত হয় পার্লামেন্ট বা জনমতের ভিত্তিতে

- খিলাফতে নেতৃত্বের উৎস আমানত ও তাকওয়ার ভিত্তিতে। অন্যদিকে গণতন্ত্রে জনসংখ্যা ও জনসমর্থনের ভিত্তিতে ।
- খিলাফতের লক্ষ্য আল্লাহর বিধান কায়েম। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের লক্ষ্য জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়ন।

এই দ্বৈত আদর্শিক অবস্থানের মধ্যে খিলাফতকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে কায়েম করতে চাওয়াটা একটা কেবলই আত্মপ্রতারণা।

৪. ইতিহাসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খেলাফত কায়েম হয়নি

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের সূচনা থেকে নবী করিম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনও গণতন্ত্রের কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। আবু বকর (রাঃ) থেকে শুরু করে উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) – কেউই ক্ষমতায় আসেননি গণভোট বা প্রচারণার মাধ্যমে। বরং যোগ্যতা, তাকওয়া, আমানতদারি ও সাহাবাদের শূরার ভিত্তিতেই নেতৃত্ব স্থির হতো।

উল্লেখ্য, প্রথম চার খলিফার পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতেও গণতন্ত্রের কোনো উপাদান ছিল না। এর থেকে বোঝা যায়, খিলাফত কায়েমে গণতন্ত্রের কোনো ঐতিহাসিক নজির নেই। বরং ইতিহাস প্রমাণ করে, গণতন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েম করতে গিয়ে দলগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভক্তি এবং নীতিহীন আপোসই বেশি ঘটেছে।

৫. গণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা: এক ফাঁদ

যে দল বা সংগঠনই গণতন্ত্রে অংশ নেয়, তাকে সংসদীয় বিধিব্যবস্থা, সংবিধান ও বিচারবিভাগের অধীন হতে হয়। এমনকি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও "ধর্মবিদ্বেষ নয়", "উগ্রতা নয়" – এমন সব বিধিনিষেধ মানতে হয় যা প্রকৃত ইসলামি দাওয়াতের পরিপন্থী।

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ মানে তাগুতী আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে:

"তারা চায় তাগুতের শাসন অনুযায়ী বিচার করতে, অথচ তাদের প্রতি আদেশ হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করার।" (সূরা নিসা: ৬০)

খিলাফত একটি স্বতন্ত্র ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে কায়েম হয় এবং পরিচালিত হয় আল্লাহর বিধান দ্বারা। গণতন্ত্র, তার দর্শন ও পদ্ধতিগত কাঠামো—দু'টোই এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতর থেকে খিলাফত কায়েমের চিন্তা করা কেবল ভ্রান্ত ধারণাই নয়, বরং তা উম্মাহকে দ্বীনের মৌলিক দর্শন থেকে বিচ্যুত করার এক মারাত্মক পথ।

যদি সত্যিই খেলাফত কায়েম করতে হয়, তবে প্রথম শর্ত হলো—তাগুতী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে নতুন কাঠামো গড়া। অন্যথায়, খিলাফতের নামে শুধুই এক "ইসলামি আবরণে মোড়ানো গণতন্ত্র" দেখা যাবে—যা ইসলাম নয়, ইসলামের এক ভ্রমমাত্র।

## উপসংহার

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সংঘাত নিছক কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য নয়—এটি বিশ্বাসের, দৃষ্টিভঙ্গির, এবং শাসনের উৎস ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত গভীর মৌলিক বিরোধ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কুরআন-সুন্নাহর বিধান, এবং হালাল-হারামের নির্ধারক হিসেবে কেবল আল্লাহর ইচ্ছাকে গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো মানুষের সার্বভৌমত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত, এবং আইন প্রণয়নে মানুষের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে মানা।

গণতন্ত্রের জন্ম ইতিহাসে এক বিপর্যয়কর অধ্যায়—যেখানে খ্রিস্টান পাদ্রীদের অন্যায়, শোষণ ও ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় জনগণের দীর্ঘ বিদ্রোহ পরিণত হয় এক ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায়, যেখানে আল্লাহর আইনকে সমাজজীবন থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কিন্তু ইসলাম শুরু থেকেই এমন একটি ব্যবস্থার কথা বলে, যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার—সব কিছু পরিচালিত হবে আল্লাহর বিধানের আলোকে।

আজকের দুনিয়ায় কিছু মুসলিম গণতন্ত্রকে ইসলামের সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা করছেন, কেউ বলছেন "ইসলামী গণতন্ত্র", কেউ "মৌলিক গণতন্ত্র"—এগুলো মূলত ইসলামী আকীদার সঙ্গে

আপোসমূলক চেষ্টা, যা বিশ্বাসের খাঁটিতাকে দুর্বল করে দেয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা—কারণ এর প্রতিটি স্তরই ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

খেলাফত প্রতিষ্ঠা কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়, এটি এমন এক ঈমানদার নেতৃত্বের দাবি রাখে, যারা আল্লাহর বিধানকে সর্বোচ্চ মনে করে এবং সমাজে তা বাস্তবায়নের জন্য নির্ভীকভাবে কাজ করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে এই ঈমানদার নেতৃত্ব টিকতে পারে না—বরং বাধ্য হয় আপোস, জোট, পাপিষ্টদের খুশি করা ও শরিয়া বিরোধী শপথ নিতে।

সুতরাং, ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটি আলাদা আদর্শ, দুটি ভিন্ন পথ—যার একটির পথ শান্তির দিকে, অপরটির পথ বিভ্রান্তির দিকে। মুসলিম উম্মাহ যদি সত্যিই আল্লাহর খিলাফত ও তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে গণতন্ত্র নামক তাগুতী ব্যবস্থার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে, ইসলামের নিজস্ব পথেই ফিরে আসতে হবে—যা সাহাবা ও সালাফে সালেহীনদের আদর্শে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাসিত। আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুধু ব্যর্থই নয়, তা এক ভয়াবহ আত্মপ্রতারণা ও আকীদার দুর্বলতার পরিচয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাগুতী মতাদর্শের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন এবং খাঁটি ইসলামী খেলাফত কায়েমের তাওফিক দিন—যেখানে কেবল আল্লাহর আইনই হবে সর্বোচ্চ, এবং নবী ﷺ-এর সুন্নাহই হবে জীবন পরিচালনার একমাত্র আদর্শ।